প্রথম অধ্যায়॥

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

যে কোন স্রষ্টার সৃষ্টির মূলে কাজ করে তাঁর বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ-পরিমণ্ডল, জীবনবোধ ও ব্যক্তিত্ব। কাজেই, প্রত্যেক সাহিত্যিকের সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর ব্যক্তি জীবনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই লক্ষেই কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন-কথা এই অধ্যায়ে প্রতিফলিত করা হয়েছে। তাই, এখানে ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী নরেন্দ্রনাথকেও আমরা উপলব্ধি করবো বলে মনে করি।

পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামের পশ্চিমে বয়ে চলেছে কুমার নদী, পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত শস্য-শ্যামলা মাঠ। পল্লী-প্রকৃতির এই শান্ত স্নিগ্ধ কোলেই ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই মাঘ (১৯১৬, ১৩ই জনুয়ারী) নরেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাদের বৃহৎ একান্নবর্তী সংসারের ভার ছিল পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্রের অর্থাৎ বাড়ির মেজো কর্তার উপর। কারণ বড়কর্তা মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে দুটি ছেলে মেয়ে রেখে মারা গিয়েছিলেন। যেহেতু এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল মহেন্দ্রনাথের উপর, সেহেতু অল্প বয়সেই তাঁকে বিবাহ দেওয়া হয় মানিকদি গ্রামের চতুর্দশ বৎসরের সুন্দরী কন্যা জগৎমোহিনী দেবীর সঙ্গে। কিন্তু বার কয়েক মৃত কন্যা-সন্তান প্রসব করায় পরিবার থেকে পুনরায় মহেন্দ্রনাথকে বিবাহ দেওয়া হয় বিরাজবালা দেবীর সঙ্গে। এই বিরাজবালা দেবীর গর্ভেই নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পরিবারের শান্তি রক্ষার তাগিদে তথা মানবিকতার বশে বিরাজবালা দেবী তাঁর প্রথম সন্তান – নরেন্দ্রনাথকে সন্তানহীনা জগৎমোহিনী দেবীকে দান করেন। তাঁর কোলেই নরেন্দ্রনাথ সন্তান পরিচয়ে লালিত পালিত হতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে আরো একটি পুত্র ও কন্যার জন্মের পর বিরাজবালা দেবীর মৃত্যু হলেও নরেন্দ্রনাথ মাতৃবিয়োগের দুঃখ অনুভব করেননি। এই আন্ত রিকতা-ই বোধ হয়, তৎকালীন একান্নবর্তী পরিবার পরিচালনার মূল চাবি-কাঠি ছিল। পারিবারিক এই একাত্মতার আবহ শৈশব থেকেই নরেন্দ্রনাথের মানস-লোকে ক্রিয়া করে। তার ছাপ পরবর্তী সময়ে বহু গল্প-উপন্যাসে ধরা পড়েছে।

বালক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনে সবচেয়ে জীবন্ত প্রাণবান পুরুষ ছিলেন পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্র। দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যের অধিকারী এই শক্তিমান পুরুষটি একাধারে যেমন বৈষয়িক ছিলেন তেমন ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পরসিক। গানের পাশাপাশি অভিনয়, তাস-পাশা খেলায়ও তিনি সমান

পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সাহিত্য প্রীতিও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। বিদ্যাপতি-চন্ডিদাসের পদাবলীও তিনি চর্চা করতেন। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে বালক পুত্রকে বিছানায় ডেকে নিয়ে একের পর এক সংস্কৃত শ্লোক তিনি আবৃত্তি করতেন, আবৃত্তি করাতেন। পরবর্তী সময়ে 'সূর্যসাক্ষী' উপন্যাসে মন্দিরার বাবার চরিত্র অঙ্কনে লেখক যে পিতার এই ধ্যানগম্ভীর স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তির দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তি মানুষটি লেখকের ব্যক্তিত্বকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তা তাঁর স্বীকারোক্তিতেই ধরা পড়ে – ''ভাবতে ভালো লাগে জীবন প্রভাতে সেই গীতগুঞ্জিত ভোরবেলাগুলি আমার মধ্যে অনু প্রবেশ করেছে। সেই সুর কণ্ঠে ধরা দেয়নি। কলমে কিছুটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ....এই কোমলে-কঠিনে গড়া একই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি ও শিল্পবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ বহুকর্মা পুরুষটির প্রায় কিছুই আমি পাইনি। না তাঁর আকার, না তাঁর প্রকৃতি। শুধু সাহিত্যপ্রীতি, শুধু যৎসামান্য লেখার শক্তি। শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।"[১]

শুধু পারিবারিক পরিমণ্ডল নয়, বাইশটি গ্রামের একটি মৌজা ছিল সদরদি গ্রাম। সেই গ্রামে নানা জাতির বসবাস ছিল। মধ্য পাড়ার উত্তরে সাহাপাড়া ছিল। দোকানপাট, ছোটখাটো ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল এদের জীবিকা। গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূরে 'ভাঙা শহর' অবস্থিত। তা ছিল গ্রামের অনেকেরই ব্যবসার প্রধান ক্ষেত্রভূমি। সেখানে সোম ও শুক্রবার হাট বসত। কুমার নদীর বুকে খেয়া নৌকাই ছিল পারাপারের ব্যবস্থা। এই নদী বর্ষাকালে প্রতিবছরই প্লাবিত হলে খাল-বিল ভরে যেত ঠিকই কিন্তু দু'একবার বন্যার বছর ছাড়া গৃহস্থের উঠোনে কখনো জল উঠত না। সারা বছর নদীতে জল থাকত। গ্রাম বাংলার এই প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবনেরও ছোট ছোট সুখ-দুঃখের ঢেউ লেখকের মননকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে তারই প্রতিফলন লক্ষণীয় বিষয়। এছাড়াও তাঁর বিভিন্ন গল্পে এ পটভূমি বারবার ফিরে এসেছে। পল্লী বাংলার বিভিন্ন বিত্তের ও বৃত্তির মানুষের জীবন-যাত্রা রুচি-মানসিকতাও তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এবিষয়ে তাঁর অভিব্যক্তি – "....সেই পাড়ায় নানা জাতের বাস ছিল। চাষী মুসলমান যেমন ছিল তেমন ছিল ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, ব্যবসায়ী, সাহা-সম্প্রদায়, জেলে-জোলা আরও বহু রকমের বৃত্তিজীবি। এদের প্রতিটি ব্যক্তি, কি প্রতিটি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তা নয়। কিন্তু এই পটভূমি কখনো জ্ঞাতসারে কখনো অজ্ঞাতে আমার চিত্তভূমিকে এক বিশেষ ধরণের রূপবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।"[২] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় – লেখকের বাড়ির পূর্বদিকের পুকুরের চারধারে অজস্র খেজুর গাছ ছিল। প্রতিবেশী কিষানরা

সেই সব খেজুর গাছের মাথা চেঁচে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির্ ঝির্ করে রস পড়ত। সেই রস মাটির হাঁড়িতে জ্বালিয়ে লেখকের মা-জ্যেঠীমারা গুড় তৈরী করতেন। জীবনের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে তিনি 'রস' গল্পের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করে তিনটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে জীবন রসের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন।

সচ্ছল পরিবার হওয়ার সুবাদে অনেকেই সপরিবারে এই মিত্র বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করত। সেই সূত্র ধরেই ছেলেবেলা থেকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র অনেক ব্যক্তি মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে এক এক ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরাই পরবর্তীকালে লেখকের নানা রচনায় স্থানলাভ করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য – চাকলাদার ঠাকুরদা, যিনি সম্পর্কে লেখকের পিতা মহেন্দ্রনাথের মামা ছিলেন। ভবঘুরে এই মানুষটি নানা গুণের অধিকারী হলেও কোন গুণপনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তিনি হাউই, তুবড়ি, চরকি – নানা রকমের আতসবাজি তৈরী করতে জানতেন। গল্পকারের 'আতসকর' গল্পের নায়ক জগৎ ভুঁইমালী যে এই চাকলাদার ঠাকুরদারই প্রতিমূর্তি সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না। তিনি স্থায়ীভাবে যখন এই মিত্র বাড়িতে উপস্থিত হন তখন সঙ্গে নিয়ে আসেন – তবলা, তরঙ্গিণী ও একটি কাঠের বাক্স বোঝাই বই। তাতে ছিল রামায়ণ, মহাভারত, মাইকেল গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধ এবং এখন যারা বিস্মৃতনামা, তাঁদের বহু নাটক উপন্যাস। বাল্যকালে ওই কাঠের বাক্সটির প্রতি নন্দ্রেনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেটি তিনি নিজের দখলেই রেখেছিলেন। জানা যায় – ঐ বাক্সে 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ' নামক একখানা পৌরাণিক নাটক লেখক পেয়েছিলেন। সে বইয়ের প্রথম ও শেষভাগ ছিন্ন ছিল। তবু ঐ নাটকের অনুকরণে তিনি একটি নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কাজেই, বলা যায় – শিল্পী মননকে পরিপুষ্টি দানে এই বইগুলিরও বিশেষ ভূমিকা বর্তমান ছিল।

বালক নরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয় – গাঁয়ের শিক্ষক অক্ষয় কুমার শীল মহাশয়ের কাছ থেকে। তিনি অঞ্চলের মধ্যে একজন নামকরা কীর্ত্তনীয়াও ছিলেন। কিন্তু মাস্টার হিসাবে তিনি ছিলেন ভীষণ রূঢ় স্বভাবের। অথচ তিনিই যখন কীর্ত্তনের আসরে নামতেন তখন শ্রোতারা উৎকর্ণ হয়ে থাকত। কীর্ত্তনের সেই সুর-মূর্চ্ছনা লেখকের বালক চিত্তকেও দোলায়িত করেছিল। তাঁর অনুরণন প্রাপ্ত বয়সে এসেও কথাকার বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভাল লাগার এই জায়গা থেকেই তিনি 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে একটি আত্মভোলা কীর্ত্তনীয়াকে সযত্নে গড়ে তুলেছিলেন। এবিষয়ে লেখকের মতামত – "বইখানির মধ্যে একটি কীর্ত্তনের দল আছে। একটি

চরিত্র আছে আত্মভোলা কীর্ত্তনীয়ার। এই চরিত্রে আমার সেই বাল্য শিক্ষকের ছাপ পড়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাঁর মাস্টারিটুকু হরণ করেছিলাম, বর্জন করেছিলাম তাঁর রূঢ়তা। গুরু-দক্ষিণা দিয়েছিলাম, তাঁকে রূপ-লাবণ্যময় পুরুষ করে তুলে, সেই দৈহিক রূপ তাঁর নিজের ছিল না।"[৩]

পরিবারের আরও দু'জন মানুষ সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিলেন। প্রথমত – বাবার মাতৃসমা পিসিমা, যিনি নিঃসন্তান বাল্যবিধবা ছিলেন। লেখক তাকে 'ভাই' বলে ডাকতেন। তিনি ভাইপোদের সন্তান স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন। তাঁর মুখে মৃত কাকাদের কথা শুনতে শুনতে তিনি যেন রূপকথার জগতের সন্ধান পেতেন। লেখক তারও স্নেহ ছায়ায় লালিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ছিলেন – বিশ বছরের বড় জ্যাঠতুতো দাদা। বংশের মধ্যে তিনিই প্রথমে কলেজে পড়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই ছোটদের কাছে তিনি ছিলেন বিস্ময়ের পাত্র। কর্মসূত্রে তিনি কলকাতা শহরে থাকতেন। তাঁর মুখেই লেখক প্রথম রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা আবৃত্তি শোনেন। চিঠি লেখা ছিল এই বড়দার অন্যতম বিলাস। যে বিষয়টি কিশোর নরেন্দ্রনাথকেও কৌতূহলী করে তুলেছিল। চিঠি লেখার প্রতি তাঁরও বিশেষ উৎসাহ গড়ে ওঠে। এই উৎসাহ-ভালোলাগা থেকেই যে গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'পত্রবিলাস' গল্পের কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন তা নিশ্চিত। এছাড়া বহু গল্প ও উপন্যাসেও তিনি চিঠির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছিলেন। চিঠি-ই যেন সেখানে এক একটি চরিত্র তথা সম্পর্কের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে 'চেনামহল' ও 'শুক্লপক্ষ' উপন্যাসে লেখা শেষ চিঠিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই বড়দাদা যখন একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যান তখন তাঁকে নিয়ে সংসারে নানা অশান্তির, মান-অভিমানের বাতাবরণ তৈরী হয়। সে বিষয়কে ঘিরে লেখক পারিবারিক ইতিবৃত্ত লিখেছিলেন ডায়েরীর মত করে। যার প্রথম পাঠক ছিলেন পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্র। এই ভাবেই নানাবিধ টুকরো টুকরো লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'হাতেখড়ি' হয়েছিল।

আর একটি চরিত্র লেখক মনে বিশেষ ভাবে দাগ কেটেছিল। তিনি ছিলেন কার্তিক দেউড়ী। তিনি জাতিতে সাহা, বৃত্তিতে কুমার ছিলেন। বছরে বছরে যে মাটির প্রতিমা তিনি গড়ে তুলতেন, পূজার পর তা বিসর্জিত হয়ে যেত। এই মানুষটির সঙ্গে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ একাত্মতা খুঁজে পেয়েছিলেন – "আজ দেখি সেই মৃৎশিল্পীর সঙ্গে আমাদের মত অনেক বাক্‌শিল্পীরও বিশেষ কোন তফাৎ নেই। আমরাও জীবনভর কয়েকখানি মূর্তি বার বার গড়ি আর সেই মূর্তি স্মৃতির অতলে বিসর্জিত হয়।"[৪] এই মৃৎশিল্পী কার্তিক দেউড়ী-ই যে লেখকের 'যৌথ' গল্পের

স্বরূপ এবং 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের অবিনাশ চরিত্র দুটিকে গড়ে তুলতে প্রাণিত করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

১৯৩২ সালে ভাঙ্গা হাইস্কুলে ক্লাস নাইন-এ পড়বার সময় নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে 'আহ্বান' নামক একখানি হাতে লেখা পত্রিকা বের করেছিলেন। সেখানে তিনি 'মুক্তার হার' নামে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ করবার আগেই সে কাগজ বন্ধ হয়ে যায়।

ঐ বছরই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যবস্থাপনায়, খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় এবং লেখকের সম্পাদনায় গ্রাম থেকে হাতে লেখা একখানা পত্রিকা বের হয়। পত্রিকাটির নাম ছিল 'মাসিক মুকুল'। এই পত্রিকা পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামান্তরেও বিতরিত হয়েছিল। প্রত্যন্ত গ্রামে অথবা মফঃস্বল শহরের বুকে বাস করেও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করবার এমন প্রবণতা ও তাকে ঘিরে এমন কর্মোদ্যোগ-প্রয়াস নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসে পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কৈশোর থেকে একটি সাংস্কৃতিক আবহ তাঁর মনোভূমিতে ক্রিয়া করেছিল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভাঙ্গা হাইস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। সেখানেই সহপাঠী সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দু'জনেই সাহিত্যচর্চায় পরস্পরের সঙ্গী হন। তাঁদের যৌথ উদ্যোগে 'জয়যাত্রা' নামে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্রিকার শুভ সূচনা হয়। সেখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'নিখিলের চিঠি' নামে একটি পত্রোপন্যাস লেখা শুরু করেন। অপরদিকে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। তবে সেই যাত্রাও বেশিদূর এগোয়নি।

ঐ বছরেই কলেজের অন্য একদল বন্ধু – সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অচ্যুত গোস্বামী, অরুণ কুমার মুখোপাখ্যায়, রণেন মজুমদার, শান্তিপ্রিয় ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে মিলিত হয়ে লেখক 'অভিসার' নামে হাতে লেখা একখানা কাগজ বের করেন। এর সম্পাদক ছিলেন শান্তিপ্রিয় ঘোষ। তিনি 'শ্যামলী সেন' নামক একজন কল্পিতা সঙ্গিণীকেও এই গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। এই 'অভিসার'ও রুদ্ধ হয়। এ পর্যন্ত সময়-কালকে কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'লেখক জীবনের অমুদ্রিত প্রস্তুতিপর্ব' বলে উল্লেখ করেছেন।

এর পর ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পাশ করে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাসে তিনি ভর্তি হন। এখান থেকেই তাঁর প্রবাস

জীবন শুরু হয়। এসময় তিনি বউবাজারে এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। সেই বাড়ির দু'জন ছেলে অর্থাৎ রাধা ও কেষ্টকে পড়ানোর বিনিময়ে লেখকের বাসাহারের ব্যবস্থা হত। যদিও এই ব্যাপারটি অনুচ্চারিত ছিল বলেই লেখক তাঁর 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন।। এ সময় বি.এ. পড়তে পড়তে এবং রাধা ও কেষ্টকে পড়াতে পড়াতে এই বউবাজারের মাঠকোঠার দোতলা কাঠের ঘরে বসে লেখক যা লিখতেন সেগুলি কোন হাতে লেখা পত্রিকার জন্য নয়, কলকাতার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার জন্য। রাধার এমনিতে পড়াশুনায় আগ্রহ কম থাকলেও লেখক যখন লিখতেন সে তখন তাকিয়ে তাকিয় দেখত। এবং সে বুঝত এ লেখা কলেজী লেখা নয়, 'এটা একটা বিশেষ গুণ'। এই বিশেষ গুণ-এর কথা সে শুধুমাত্র অনুভবই করেনি, বন্ধুমহলে তা প্রচারও করেছিল। লেখক জীবনের এই প্রথম পর্বের প্রেরণাদাতাকে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এসেও বিশেষ ভাবে স্মরণ করেছিলেন। লেখকের জীবনের প্রথম উনিশ বছর কাটে সদরদি ভাঙ্গা ফরিদপুরে। বাদ বাকীটা কলকাতায়। কাজেই এরপর তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় বাসা বাড়ি বদল করতে হলেও বউবাজারের এই দ্বিতল মাঠকোঠার প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। কারণ তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেমপর্বের মহরতও এই মাঠকোঠাতেই ঘটে। সেকথা তিনি সরাসরি না বললেও তাঁর 'পরোক্ষ', 'চড়াই-উৎরাই', 'নিরুদ্দেশ' ও 'উদ্যোগপর্ব' গল্পের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের পুত্র অভিজিৎ মিত্রের কথা এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যায় – "মাঠকোঠাটা যে বাবাকে কেন এত টানে, তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর লেখালেখির মুদ্রণপর্বের সূত্রপাত এইখানেই, শুধু সেই কারণেই নয়। নিগূঢ় কারণও একটি ছিল। .....প্রথম যৌবনের প্রেমকথা আলাদা করে বলে যাননি। বলে গেছেন গল্পে পরোক্ষ, চড়াই-উৎরাই, নিরুদ্দেশ ও উদ্যোগপর্ব। বাবার কোন গল্পই একমাত্রিক নয়। সব গল্পই বহুমাত্রিক। তবে এই গল্পগুলির একটি মাত্র নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেম। অস্ফুট প্রেম। এবং তার ক্ষেত্র বলতে বউবাজারের একটি দ্বিতল মাঠকোঠা।"[৫]

এখান থেকেই সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ভিন্ন খাতে বইতে থাকে। উপন্যাস ও ছোট গল্প – কথাসাহিত্যের এই দুই ধারাতেই শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র সাফল্য অর্জন করলেও কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটেছিল। তবে তাঁর সৃষ্টির চরম উৎকর্ষতা মূলত ছোট গল্পকে কেন্দ্র করে লাভ করেছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মূক' প্রকাশিত হয়। এর মধ্য দিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখক জীবনের মুদ্রিত পর্বের শুভ সূচনা হয়। গল্পকার হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও কবিতার প্রতি তাঁর

এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন – "সে যাই হোক আমার নিজের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে ঐ নামটি যে এমন সার্থক হবে তা কখনো ভাবিনি। যদিও সেই '৩৬ সনের পর থেকে বিশ বছর ধরে কবিতা লিখেছি, তবু সেই ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে, এখন তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তাঁরাই জানেন কবিতা লেখার আনন্দ কত বেশি।"[৬] এখানে লেখক ঐ নামটি বলতে 'মূক' কবিতাটিকে বুঝিয়েছেন।

সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকেই নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে কবিতা লেখার জন্য বিশেষ উৎসাহ দিতেন। নিজের 'কবিতা' পত্রিকায় তিনি লেখকের অনেক কবিতাও ছাপিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিজস্ব কাব্য গ্রন্থ 'নিরিবিলি' প্রকাশিত হলে সেই বই নিয়ে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং তাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় লিখেছিলেন – "শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পাঠক সংখ্যা আজ বিপুল, কিন্তু এ - বইখানা পড়ে (বা দেখে) আজকের দিনে কম পাঠকেরই সন্দেহ হবে যে এর প্রণেতা ও তাঁদের প্রিয় কথাশিল্পী একই ব্যক্তি।"[৭] তবে তিনি ছিলেন এক বিষন্ন কবি। যা তাঁর নিজস্ব ডায়েরি থেকেই উঠে আসে। যে ডায়েরিটি পুত্র অভিজিৎ মিত্রের তত্ত্বাবধানে এখনো অক্ষত রয়েছে।

১৯৩৬ সালেই 'দেশ' পত্রিকায় লেখা 'মৃত্যু ও জীবন' গল্পটি প্রকাশের মাধ্যমে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছোটগল্পের জগতে প্রবেশ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি গল্প লিখেছিলেন। ১৯৩৮ সনে লেখক জীবনের আর এক পর্বে এসে উপস্থিত হন। অর্থাৎ এই বছর চোমড়দি গ্রামের অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ -এর জ্যেষ্ঠা কন্যা সঙ্গীতশিল্পী শোভনা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। লক্ষণীয়, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সঙ্গীতপ্রীতির দিকটি ও সঙ্গীতশিল্পীকে কথাসাহিত্যিক তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে বিশেষভাবে চিত্রিত করেছিলেন। 'সেতার', 'বিলম্বিত লয়' গল্প ও 'অনুরাগিনী', 'সুরের বাঁধনে' ইত্যাদি উপন্যাস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্ত্রী শোভনাদেবীর সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মত। বিয়ের পর স্ত্রী দেশের বাড়ি থাকায় চিঠি লিখে তিনি তাঁকে কবিতা পড়াতেন। গল্পের বই পাঠাতেন। এইভাবে তিনি স্ত্রীর মধ্যে শিল্পবোধ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সৌখিন এই শিল্পী মানুষটি মাঝে মাঝেই স্ত্রীর জন্য নিয়ে আসতেন খোঁপায় বাঁধার জন্য ফুল ও ফুলের মালা। শোভনাদেবীর সঙ্গে লেখক তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ -দুঃখই ভাগ করে নিতেন। কখনো কখনো লেখা মাথায় না এলে ভীষণ মন খারাপ করে স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলতেন –"ছবি, আমি আর লিখতে পারছি না।"[৮] শোভনাদেবীর অনুপ্রেরণায় আবার যখন নতুন কিছু লিখতেন তখন তিনি শিশুর মতই খুশি হয়ে উঠতেন।

পরের বছর তিনি বঙ্গবাসী কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে দমদমের অর্ডিনান্স ফ্যাক্টারিতে প্রথম চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আর বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একযোগে লেখকের 'জোনাকি' নামে একখানি কাব্য সংকলন বেরিয়েছিল। এর অনেকদিন পরে তাঁর স্বতন্ত্র একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। যার নাম ছিল 'নিরিবিলি'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম ও বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' ১৯৪৭ সনে বই আকারে আত্মপ্রকাশ করলেও এটি ১৯৪২-৪৩ -এ 'হরিবংশ' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের হয়েছিল। এ সময় তিনি কালি-কলমের সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে নিবেদিতা লেনের একটি বড়িতে থাকতেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মুরলীধর বাবুর নামটি উপন্যাসে ব্যবহার করায় তিনি ঠাট্টার সুরে অভিযোগ জানিয়েছিলেন – 'আপনি আমার নামটি চুরি করলেন কেন? চুরি করে এমন একজনকে দিলেন যার সঙ্গে আমার স্বভাবের কোন মিল নেই। আমি অমন দুশ্চরিত্র?'[৯] উত্তরে লেখক জানিয়েছিলেন – "আপনার ওপর আমার খুব লোভ। আপাতত শুধু নামটিই নিলাম। পরে মানুষটিকেও নেব।"[১০] 'হরিবংশ'-এর সম্পূর্ণ ফাইলটি পড়ে বন্ধু সন্তোষ কুমার ঘোষ লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের অভিব্যক্তি –"জানি না সেদিনে সেই প্রশস্তির মধ্যে কতখানি সাহিত্য বিচার ছিল, কতখানি বন্ধুকৃত্য। কিন্তু আমি সেদিন দারুণ উৎসাহ পেয়েছিলাম। পরিবর্তন পরিবর্ধনের পরে যখন হরিবংশ রূপান্তরিত হয়ে দ্বীপপুঞ্জ নামে বেরোল বইখানি উৎসর্গ করলাম আমার সেই উৎসাহদাতাকে।"[১১]

১৯৪২ সালে লেখকের পিতা মহেন্দ্রনাথ মিত্র পরলোক গমন করেন। এসময় লেখক ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে যোগদান করলেও কিছুদিনের মধ্যে জব্বলপুর শাখায় বদলি হয়ে যান। এই জব্বলপুরের পটভূমি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'সহৃদয়া' উপন্যাসে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'অসমতল' প্রকাশিত হয়। কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘ চার দশক ধরে মোট চার'শোটি ছোটগল্প লিখেছেন যার বেশিরভাগ গল্প আনন্দ পাবলিশার্সের সাহায়তায় ও পুত্র অভিজিৎ মিত্রের সম্পাদনায় গল্পমালা-১ থেকে গল্পমালা-৭ এ বিন্যস্ত আছে। তবে গল্পমালাগুলিতে একসূত্রেগ্রথিত হওয়ার আগে গল্পগুলি 'অসমতল', 'হলদে বাড়ি', 'উল্টোরথ', 'অসবর্ণা', 'ধূপকাঠি' ইত্যাদি গল্প সংকলনে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই গল্প সংকলনগুলি দুষ্প্রাপ্য। ওপার বাংলার পল্লী প্রকৃতি, কোলকাতার আশেপাশে মফঃস্বল স্থান এবং মহানগর কোলকাতা – এই চিরপরিচিত তিনটি ভূ-খণ্ডকে কেন্দ্র করেই তাঁর গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের স্বীকারোক্তিকে তুলে ধরা যায় – "বাস্তব আর কল্পিত, অরচিত আর স্বরচিত

সব মিলিয়ে এই গল্পগুলি যেন আমারই জীবনবৃত্ত। ..... সব লেখকই নিজের চেনাজানা গণ্ডির ভেতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমি তাঁদের ব্যতিক্রম নই।"[১২]

ব্যাঙ্কে কর্মরত অবস্থায় ১৯৪৭ সালে গল্পকার একটি আইনগত জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেও পরে নির্দোষ প্রমাণিত হন। এবিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত রায়। পুনরায় ব্যাঙ্কের চাকরিটি ফেরৎ পেলেও তিনি পদত্যাগ করেন। দেশভাগের পর পরিবার পরিজন নিয়ে তিনি ১১৯ /বি, নারকেলডাঙ্গা মেন রোডের বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এসময় 'সোনার তরী' পত্রিকায় তাঁর 'অক্ষরে অক্ষরে' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বিখ্যাত 'রস' গল্পটিও লেখক এসময় রচনা করেন।

এরপর ১৯৪৮ সালে কর্মসূত্রে তিনি 'সত্যযুগ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানে গৌরকিশোর ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল কর, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রকাশন সংস্থায় তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। এ সময় সাগরময় ঘোষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখকের বিখ্যাত উপন্যাস 'চেনামহল' প্রকাশিত হতে থাকে। এই রচনা প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য – "কিস্তিতে কিস্তিতে লিখতাম। সাগরবাবু প্রেরণা দিতেন, তাড়ণাও করতেন। কিস্তি খেলাপ হলে বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয় দেখাতেন।"[১৩] এই উপন্যাসটি লিখবার সময় কথাকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র সপরিবারে লিন্টন স্ট্রিটের একটি বাড়িতে থাকতেন। সে বাড়ির অবস্থা ভালো না থাকলেও বন্ধুজনের আনাগোনায় আর লেখার প্রচুর্যে, স্ফূর্তিতে সেই গৃহটির কথা লেখকের জীবনে স্মরণীয় হয়েছিল। এই চনাটি তিনি সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়কে উৎসর্গ করেছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সাল থেকে পাইকপাড়া ২০/১/এ, রাজা মণীন্দ্র রোডে মিত্র পরিবার বসবাস করতে থাকেন। লেখক তাঁর পরবর্তী জীবন এই বাড়িতেই অতিবাহিত করেছিলেন। ১৯৬২ সালে এই জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'আনন্দ পুরস্কার'-এর সম্মানে সম্মানিত হন। ১৯৬৪ সালের মার্চ থেকে ১৯৬৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আর একখানি বিখ্যাত তথা বৃহত্তম উপন্যাস 'সূর্যসাক্ষী' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটির প্রসঙ্গে লেখকের অভিমত এরূপ –"এখানি আমার বৃহত্তম উপন্যাস। প্রিয়তম কিনা সে সম্বন্ধে এখনও মনস্থির করিনি।"[১৪] ১৯৬৫ সালে এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর প্রিয় সুহৃদ সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে এই রচনাটি উৎসর্গ করেছিলেন।

সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাম-ডান কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি একমাত্র মানবিকতার ধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। জানা যায়, কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থে বরানগরে একটি দল তৈরী হয়েছিল, সেই দলকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃতুর পর শ্মশানে সাহিত্যিক হিসাবে একমাত্র তিনিই উপস্থিত ছিলেন। স্বল্পভাষী এই মানুষটি মনের দু ঃখ-কষ্টকে সেভাবে কখনোই প্রকাশ করতে পারেননি। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর বিরল প্রতিভার অধিকারী এই মানুষটি পরলোক গমন করেন। রেখে যান স্ত্রী শোভনা মিত্র ও দুই পুত্র দিবাকর ও অভিজিৎ মিত্রকে। জীবনের শেষ দিনে তাঁর শেষ লেখা গল্পটি হল - 'মিনিবাস' যা তিনি নিজের হাতেই পত্রিকা অফিসে দিয়ে এসেছিলেন।

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস ও বড় গল্প বা নভেলেটের সংখ্যা ৫৮টি। যা আনন্দ পাবলিশার্সের সহায়তায় উপন্যাস সমগ্র-১ থেকে উপন্যাস সমগ্র-৫ এ বিন্যস্ত হয়েছে। এগুলি হল – 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন', 'চেনামহল', 'শুক্লপক্ষ', 'চেরাবালি', 'তিন দিন তিন রাত্রি', 'পরম্পরা', 'রূপমঞ্জরী', 'জলপ্রপাত', 'অক্ষরে অক্ষরে', 'গোধূলি', 'দূরভাষিনি', 'সঙ্গিনী', 'অনু রাগিনী', 'সহৃদয়া', 'কন্যাকুমারী', 'সুখদুঃখের ঢেউ', 'অনমিতা', 'উত্তর পুরুষ', 'হেডমাস্টার', 'নায়িকা', 'উপনগর', 'মুগ্ধ প্রহর', 'পতনে উত্থানে', 'দ্বৈতসঙ্গীত', 'তমস্বিনী', 'মহানগর', 'সেতুবন্ধন', 'সূর্যসাক্ষী', 'পুত্রেষ্টি', 'উপচ্ছায়া', 'প্রতিধ্বনি', 'দয়িতা', 'অন্বেষণ', 'দ্বন্দ্ব', 'আবর্ত', 'প্রথম তোরণ', 'আর এক পৃথিবী', 'সেই পথটুকু', 'পূর্ব ফাল্গুনী', 'নীড়ের স্বপ্ন', 'নতুন ভুবন', 'জল মাটির গন্ধ', 'দ্বিধা', 'সুরের বাঁধনে', 'স্বপ্নসায়র', 'অনাত্মীয়া', 'নতুন তোরণ', 'মৌন মাধুরী', 'মিলনে বিরহে', 'অন্য স্বাদ', 'সূর্যমুখী', 'ভালোবাসা', 'সিঁদুরে মেঘ', 'নির্বাসন', 'সাধ সুখ স্বপ্ন' ও 'বর্ণবহ্নি'। এছাড়া কিশোর গল্প রচনাতেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। 'কুশল', 'প্রথম প্রবাস', 'ময়ূরপঙ্ক্ষী', 'নষ্টচন্দ্র', 'বাটি চালান', 'হারান মাস্টার', 'কুমীর', 'শোক', 'মোহনবাঁশি' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু রচনা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে যেমন – 'অবতরণিকা', 'হেডমাস্টার', 'পালঙ্ক', 'গোধূলি', 'শাস্তি', 'বিলম্বিত লয়' ইত্যাদি। 'অবতরণিকা' গল্পটিকে স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ছায়াচিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। এর নাম তিনি দিয়েছিলেন 'মহানগর'। পরবর্তী সময়ে শিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ গল্পটিকে কিছু সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে 'মহানগর' নাম দিয়েই পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ দেন। তাঁর 'রস' গল্পটিকেও হিন্দি চলচিত্রে

রূপায়িত করা হয়েছে। যা সিনেমা জগতে 'সওদাগর' নামে সুপরিচিত। এছাড়া টিভি সিরিয়ালে তাঁর গল্পের চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছেন মৃণাল সেন। কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু গল্প ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর 'হেডমাস্টার' গল্পটিও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এছাড়া লেখকের 'মহানগর' উপন্যাসটি ইংরাজি, হিন্দি ও মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। হিন্দি ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী শোভনা মিত্র সহায়তা করেছিলেন। তাঁর 'দেহমন' উপন্যাসটির হিন্দি অনুবাদের প্রথম নাম ছিল – 'মন্ কী পিয়াস, তন্ কী পিয়াস'। কানাড়ি ভাষায়ও গল্পকারের কিছু গল্প অনুবাদ করেছেন সিমোগার ইংরাজি অধ্যাপক বেণুগোপাল রাও। দুটি সংকলনে অনুবাদটি বিধৃত ছিল।

চল্লিশের দশকের সূচনাপর্ব থেকে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা অক্ষুন্ন ছিল। এই বিস্তৃত সময়পর্বে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যের জগতে স্বমহিমায় এক স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অভিজ্ঞতালব্ধ চেনা জগতের চেনা মানুষগুলির সাধারণ জীবনযাত্রা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূল উপাদান ছিল। এই চেনা গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষগুলির নিস্তরঙ্গ জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, পাওয়া-না পাওয়ার যন্ত্রণাকে লেখক তাঁর কলমের সাহায্যে খুঁটে খুঁটে তুলেছেন। এই চেনা গণ্ডী প্রসঙ্গে লেখকের স্বীকারোক্তি – "আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।"[১৫] গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে সন্তোষকুমার ঘোষ লিখেছিলেন - "গল্প খুঁজতেন তিনি প্রতিটি পরিচিত জীবনে, প্রত্যেকটি প্রাত্যহিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় - গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বোঝবার এইটেই একমাত্র চাবিকাঠি।"[১৬] অপরদিকে তাঁর লেখনী সৃষ্টির ভাষা প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন - "একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগত যে এত সুন্দর, সহজ সরল ভাষায় উনি কিভাবে গদ্য লিখতেন। গদ্য মানেই আমরা ভাবতাম কঠিন ভাষা, ভাষার মারপ্যাঁচ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় বুঝি। কিন্তু তাঁর গদ্যের ভাষা ছিল ব্যতিক্রম। সহজ ভাষায় জীবনের কঠিন অথচ বাস্তবকে তুলে ধরাই ছিল তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের লেখা খুব কঠিন। তাঁর এই যে স্টাইলহীন রচনা এটাই একটা স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[১৭]

অধ্যাপক সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কল্লোল যুগের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন - "মানিকের সঙ্গে তাঁর মিল এইখানে যে, দুজনেই মনোলোকের জটিলতার বিশ্লেষণে আগ্রহী। সমাজনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তমান মূল্যবোধের পটভূমে মানিক মানুষকে দেখেছেন। নরেন্দ্রনাথ সেদিকে না

গিয়ে মানুষকে বারবার ঘুরিয়ে দেখেছেন। তার এই দেখা ক্লান্তিহীন, বিরামহীন। গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নানা বৃত্তির মানুষকে, তাদের বিভিন্ন সম্পর্ককে, পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্ঘাতকে নরেন্দ্রনাথ গল্পে ধরেছেন। কেবল সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনের জটিলতা নরেন্দ্রনাথের সূচীমুখ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। তিনি হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষক, জীবনের জটিলতার রূপকার।"[১৮]

লেখক হিসাবেও নরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যক্তিস্বভাবের অনুসারী ছিলেন। কোন বিষয়েই খুব উচ্চকিত ছিলেন না, চড়া গলায় বা উত্তেজনা সৃষ্টি বা চমক সৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। আসলে তাঁর মূলধন ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি নিয়েই তিনি ব্যক্তিচরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করতেন, গড়ে তুলতেন। লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র স্বভাবে মিতভাষী ছিলেন; তবে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মুখে অজস্র ভাষা জুগিয়ে তিনি তা যেন পুষিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি প্রতিটি চরিত্রকে পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে পড়তে পড়তে গল্পে উপস্থিত চরিত্রগুলি সম্পর্কে আর কোন রকম জিজ্ঞাসা থাকে না। পাঠকবর্গকে পদে পদে কোন হোঁচট খেতে হয় না। জীবনসত্যকে, জীবনতত্ত্বকে এত সহজ সরল ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন যে, পড়ার পর ভাবতে হয় এমন অসাধারণ কথাকে এইভাবেও সাধারণ ভাষায় বলা যায়। এখানেই সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র অন্যান্যদের থেকে পৃথক। তাঁর গল্প মূলত ভালোবাসার গল্প, ভালোবাসাই তাঁর গল্প লেখার প্রেরণা শক্তি। এই প্রসঙ্গে নিজের স্বীকারোক্তি – "ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহার্দ্য স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা। পারিবারিক গন্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।"[১৯] কোন সংস্কার, ধর্ম নয়, শিল্পচর্চাই ছিল তাঁর পুজো। উপনিষদ আর গীতা এই গ্রন্থ ছিল তাঁর কাছে কবিতা।

লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনায় 'কল্যাণবাবু' নামে একজন লেখক চরিত্র আছেন। সম্ভবত এই নামটিই লেখকের ছদ্মনাম। বহু গল্পে দেখা যায়, লেখক কল্যাণবাবুর কাছে কেউ কাহিনীটি বলছে আবার হয়তো বা কোন কোন কাহিনী লেখক কল্যাণবাবুর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ গল্পের ভিতর গল্প বলার একটি রীতি লেখকের বহু ছোটগল্পে ধরা পড়েছে। এই গল্পগুলির কাঠামো, বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখলে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন অভিজ্ঞতার গভীরতা ও জীবনকে দেখার নিঁখুত দৃষ্টিভঙ্গিকে উপলব্ধি করা যায়।

উল্লেখপঞ্জি

১। আত্মকথা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ৯ ও ৮

২। ঐ, পৃঃ ৭

৩। ঐ, পৃঃ ১৫

৪। ঐ, পৃঃ ১৩

৫। পদক্ষেপ, সম্পাদক - অভিজিৎ মিত্র, সহ সম্পাদক - বন্দনা বসু, বিভাবসু মিত্র, ই-৬ ক্লাস্টার ১ পূর্বাঞ্চল, সল্টলেক কলকাতা ৭০০০৯৭, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪৭, বইমেলা সংকলন - জানুয়ারী ২০১৭

৬। আত্মকথা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৫

৭। বিষন্ন এক অক্ষরপুরুষ, আন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার ১৭ জুন ২০১৭

৮। ঐ,

৯। আত্মকথা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৬

১০। ঐ, পৃঃ ১৬

১১। ঐ, পৃঃ ১৬

১২। গল্প লেখার গল্প, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ৯-১০

১৩। আত্মকথা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গল্পমালা-২, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০০৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৭

১৪। ঐ, পৃঃ ১৮

১৫। দ্বীপপুঞ্জ উপন্যাস সম্পর্কে 'বলা বাহুল্য', নরেন্দ্রনাথ মিত্র, উপন্যাস সমগ্র-১, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল-২০০৪, ২য় মুদ্রণ জুলাই-২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃঃ – ২১৬

১৬। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ ১৫

১৭। 'উজাগর', সম্পাদক - উত্তম পুরোকাইত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষান্মাষিক পত্রিকা, দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৪১৯, উজাগর প্রকাশন, শিবানন্দ ধাম, সিজবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পৃঃ ৮

১৮। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯, পৃঃ ১৬১

১৯। গল্প লেখার গল্প, গল্পামালা-১, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৮৬, নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারী ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা নং- ১১